সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ

দক্ষিণমেরু অঞ্চলে যাবার সময় উশুয়াইয়া থেকে জাহাজে চড়েছিলাম। আর্জেন্টিনার ছোট্ট বন্দরশহর উশুয়াইয়া পৃথিবীর সর্বদক্ষিণের জনপদ। তখন থেকেই ইচ্ছা পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের শহর হ্যামারফেস্টেও একদিন যাব। উশুয়াইয়া দেখবার আগে বিশ্বমানচিত্রে চিলি ও আর্জেন্টিনার প্রায় জুড়ে যাওয়া ল্যাজের ডগায় উশুয়াইয়া যেমন একটা ফুটকি হয়েই ছিল, হ্যামারফেস্ট তেমনই উত্তর নরওয়ের উত্তরে সুমেরু মহাসাগরে স্নানরত ছোট্ট একটা ফুটকি। তার ওপরে সামান্য ডানদিকে আরেকটা ফুটকি, তার নীচে লেখা 'হোনিংসবাগ', তারও ওপরে নরওয়ের একেবারে শেষবিন্দুটি— সুমেরু মহাসাগরের কূলে নর্থ কেপ। তাহলে হ্যামারফেস্ট পৃথিবীর সর্বোত্তর শহর কেন? সেও এক ধাঁধা।

হ্যামারফেস্টে যেতে চাই, কিন্তু সেখানে যাব কী করে? ম্যাপ দেখে পথের আন্দাজ করা যায় না। বিমান বদলে বদলে হয়তো যাওয়া যায় কিন্তু আমি যেতে চাই বাসে-ট্রেনে, যদি সেভাবে যাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে একদিন আলাপ হল ডাক্তার সুধীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। লন্ডনে বহুকাল ডাক্তারি করে এখন পৃথিবীর পাঠশালায় পাঠ নিতে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ান। তখন আমাদের মহেঞ্জোদাড়ো ও মরুতীর্থ হিংলাজে যাবার তোড়জোড় চলছে, ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করছেন ভয়েজার্স ক্লাব ট্যুরস-এর ইন্দ্রজিৎ সরকার, ডাক্তার ঘোষ সেই ভ্রমণে স্বেচ্ছানিয়োজিত দলপতি। প্রথম আলাপেই আমাকে বেশ অবাক করে দিয়ে জানালেন, 'ভ্রমণ'-এ এপর্যন্ত আমি টুকরো-টাকরা যা কিছু লিখেছি তার প্রায় সব তাঁর মনে আছে।

শেষপর্যন্ত মহেঞ্জোদাড়ো, মরুতীর্থ হিংলাজ যাওয়া হল না। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ভয়াবহ ভূকম্পে স্বভাবতই সব ভেস্তে গেল।

হ্যামারফেস্ট যাত্রাও কি ভেস্তে যাবে?

ডাক্তার ঘোষ আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি ওপথে গেছেন। একদিন অফিসে এসে পথও বাতলে দিলেন। হেলসিংকি থেকে ট্রেনে রোভানিয়েমি। সেখান থেকে বাসে লেক ইনারি।

তারপর? তারপর আর কী, ক্রমশ এগিয়ে যেতে হবে। আর ট্রেন নেই, তবে বাস বদলে বদলে নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে।

এই সময় হঠাৎ মস্কো যাবার একটা মওকা মিলে গেল। ওয়ার্ল্ড এডিটর্স ফোরামের কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে জুনের গোড়ায় মস্কোয় সম্পাদকদের বিশ্ব সম্মেলনে আমার যাবার কথা পাকা হয়ে গেল। হ্যামারফেস্টের পথে মস্কোই হবে সিঁড়ির প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ সেন্ট পিটার্সবুর্গ।

ঠিক হল, মস্কোয় সম্মেলনের শেষে একদিন সারাবেলা মস্কো শহরের ছবি তুলে চলে যাব সেন্ট পিটার্সবুর্গ। রাশিয়ার এই দুই ঐতিহাসিক শহর নিয়ে ছোট একটা ভ্রমণচিত্র তৈরি করতে পারলে টিভি চ্যানেলের অন্তত কয়েকদিনের চাহিদা মেটানো খুব অসম্ভব হবে না।

রাশিয়ার কথা পরে হয়তো কখনও লিখব। প্রায় বিশ বছর বাদে মস্কোর সেই মস্কভা নদী, সেন্ট পিটার্সবুর্গের নেভা নদী, নেভার তীরে রুশসম্রাটদের সেই বিশাল উইন্টার প্যালেস— দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে কেন মোচড় দিয়ে উঠল জানি না। প্রায় কুড়ি বছর পর আবার দেখলাম সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভকে। আগেরবার মস্কোর রেড স্কোয়্যারে মে-ডেতে তাঁকে ভাষণ দিতে দেখেছিলাম, এবার এসেছেন আমাদের লাঞ্চ মিটিংয়ে। ক্রেমলিন স্টেট প্যালেসে আমাদের সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কয়েকজন বলশেভিকের সমবেত ধিক্কার শুনতে শুনতে রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের মুখের ভাবও দেখলাম। এসব ছাপিয়ে রেড স্কোয়্যারে রুশ স্থাপত্যের মাস্টারপিস সেন্ট বাসিল'স ক্যাথিড্রাল বা মস্কভা-তীরের অদূরে মস্কোর সবচেয়ে বড় গির্জা ক্যাথিড্রাল অব ক্রাইস্ট দ্য সেভিয়ার বিকেলের রাঙা রোদে কী যে মায়াময় হয়ে উঠেছিল তা ভোলাও যায় না, লেখাও যায় না।

সেন্ট পিটার্সবুর্গে উইন্টার প্যালেসে হারমিটেজ মিউজিয়ামে সারাদিন ছবি তোলার সুবাদে অনেক বিস্ময়কর শিল্পসম্ভার অনেকদিন পর আবার নতুন করে দেখা হয়ে গেল, সেও এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

রাশিয়াপর্ব শেষ করে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ট্রেনে চলে এলাম হেলসিংকি। পথের শেষ না জেনেই শুরু করলাম হ্যামারফেস্ট যাত্রা।

হেলসিংকিতে সেদিনই সন্ধ্যায় সমুদ্রবিহার। পরদিন সন্ধে নাগাদ রওনা হয়ে তার পরদিন সকালে পৌঁছলাম রোভানিয়েমি। এ শহর ভালো না বেসে পারা যায় না। যেমন মানুষজন, যেমন নির্জনতা, তেমনই সবুজ, তেমনই কোমিয়োকি নদীটা। ছোট শহরের ছোট রাস্তা যেন দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে নদীতে।

কারও মনে কোনও রাগ নেই, ভয় নেই, অধৈর্য নেই, অশান্তি নেই। সকলের মুখে এক ধরনের নিষ্ঠা আর শান্তির ছায়া। অন্যকে সাহায্য করতে সবসময়ই এক পা বাড়িয়ে আছে। রাস্তায়, নদীতে, বাজারে, রেস্তোরাঁয়, ট্যুরিস্ট অফিসে সর্বত্র এই। এমন অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা বিদেশির পক্ষে খুবই বড় জিনিস। এমনকী ক্বচিৎ-কখনও কোনও মত্ত পথচারীও পর্যটকের পক্ষে খুব একটা বিপজ্জনক নয়। এড়িয়ে গেলেই হল।

রোভানিয়েমির একটা বড় পর্যটক আকর্ষণের জায়গা সান্তা ক্লজ ভিলেজ। সুমেরুবৃত্তরেখা ডিঙিয়েই এই গ্রাম। সারাবছর লম্বা সাদা দাড়ি সান্তা ক্লজ এখানে দর্শকদের দর্শন দেবার জন্য প্রস্তুত। তাঁর ছবি তোলা নিষেধ। তবে তাঁর সঙ্গে আপনার ছবি তুলে দেবার জন্য এক তরুণী ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত। হাতে হাতে ডেলিভারি, অবশ্য ইউরোর বিনিময়ে।

আমি অবশ্য ছবি তোলার ফাঁদ কেটে স্বয়ং সান্তা ক্লজের ভিডিও তুললাম। সান্তা ক্লজের সম্মতিতেই।

শুনলাম প্রতিবছর প্রায় ৩০ লাখ মানুষ এখানে আগাম টাকা পাঠান বড়দিনের রাতে বাড়ির ছোটদের জন্য ডাকে সান্তা ক্লজের শুভেচ্ছা পেতে। সান্তা ক্লজ ভিলেজে স্যুভেনির শপ-এর ছড়াছড়ি। আমাদের নদীয়ায় নিমাইকে নিয়ে বা কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে নিয়ে এরকম পর্যটন প্রসারের সুচারু আয়োজন হলে কেমন হয় কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম।

রোভানিয়েমি ফিনিশ-ল্যাপল্যান্ডের রাজধানী। ১৯৮৭ সালে হেলসিংকিতে বিশ্ব সংবাদপত্র সম্মেলনের শেষে ল্যাপল্যান্ড ট্যুরের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু প্যারিসের ''লা মোঁদ'' আর ''ল'ফিগারো'' পত্রিকা-অফিসে সংবাদপত্র বিষয়ে আমার দিন-কয়েকের শিক্ষাগ্রহণের কথা আগে থেকেই পাকা হয়ে গিয়েছিল বলে সে যাত্রায় আর রোভানিয়েমি যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

সেবারই হেলসিংকিতে ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া মধ্যাহ্নভোজে রুপোর রেকাবিতে রেইনডিয়ারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। অত বড় রোস্টেড রাং কোন প্রাণীর— জিজ্ঞেস করে আমার পক্ষে মর্মান্তিক ওই উত্তর পেয়েছিলাম। এটা নাকি ফিনিশদের একটা ডেলিকেসি। আমি অবশ্য পরখ করার চেষ্টাই করিনি।

রেইনডিয়ার বললে আমার চেনা নাম বল্গা হরিণ মনে আসে। এতকাল পর যদি বা ল্যাপল্যান্ডের রাজধানীতে আসার সুযোগ হল, ল্যাপল্যান্ডের আদিবাসী বল্গা হরিণের দেখা পেলাম না। যাকেই জিজ্ঞেস করি, একই উত্তর— 'আরও উত্তরে যাও।' পর্যটন সংস্থার প্রচারপুস্তিকায় দেখলাম তাঁরা একবেলায় রেইনডিয়ার ফার্মে বেড়িয়ে আনেন। কেউ নিয়ে যায় গাড়িতে বা বাসে, কেউ নিয়ে যায় ইঞ্জিন লাগানো কাঠের দিশি নৌকোয় কোমিয়োকি নদী দিয়ে।

নদীতে ভেসে দেশ দেখতে আমার বরাবরই ভালো লাগে, তার ওপর এই নদী বড়ই সুন্দর, উত্তরমেরু বৃত্তরেখায় বলে বাড়তি রোমাঞ্চ। কিন্তু সুমেরুবৃত্তে ঢুকেই হরিণের ফার্ম দেখে দমে যাই। নদী থেকে তীরে নেমে মাথার চারপাশে মশার ঝাঁক তাড়াতে তাড়াতে আধ কিলোমিটার জলাভূমি পার হয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা হল কয়েকটা লোম ওঠা হরিণের সঙ্গে। তাদের চারপাশে বেড়া।

রোভানিয়েমি থেকে বাসে চলে এলাম লেক ইনারি। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার পথ। ডাঃ ঘোষ বলে দিয়েছিলেন, 'ওপথে পালে পালে রেইনডিয়ার চরতে দেখা যাবে।'

কোথায় কী! একটা রেইনডিয়ারও দেখা দিল না। বাসের কিশোর ড্রাইভারকে সেকথা জানাতে সে বলল, 'উত্তরে যাও, সেখানে পাহাড়ে দলে দলে বল্গা হরিণ চরতে আসে।'

এখনও ভালো করে গোঁফদাড়ি গজায়নি, দেখে মনে হয় স্কুলের শেষ দিককার ছাত্র, কী করে বাস চালাবার দায়িত্ব পেয়েছে কে জানে! তার থেকেও বড় ভাবনা, আমাদের কাছ থেকে টিকিটের টাকাই নেবে না! আমার সহযাত্রিণীর মনে ভয়, যে-কোনও সময়ে টিকিট পরীক্ষক এসে বিনা টিকিটের যাত্রী ভেবে মাঝপথে যদি

নামিয়ে দেয়!

আমার এই সহযাত্রিণী তথা সহকর্মিণী বিদেশে আমার ছবি তোলার ব্যাপারে ক্যামেরা, ক্যাসেট, ব্যাটারি, চিত্রায়িত দৃশ্যের নোট তৈরি ইত্যাদি কাজে সাহায্য করেন। অনেকটা রাজমিস্ত্রির কাজে যোগাড়ের মতো। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় সাহায্য, চিত্রগ্রাহকের চোখ যখন ক্যামেরায় বন্ধ, তখন লেন্সের সীমার বাইরে একই সময়ে ঘটমান কোনও দুর্লভ ও আকস্মিক দৃশ্য তিনি ক্যামেরাওলার পিঠে আলতো টোকা দিয়ে জানিয়ে দেন। এক টোকা মানে— তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমার ক্যামেরায় বন্দী হতে থাকা দৃশ্যগ্রহণের কাজ চালাতেও পারি। দু টোকা মানে— বেশ ভালো কোনও দৃশ্য। নাউ ইউ ডিসাইড— যেটা তুলছ সেটাই তুলে যাবে, না এইটা তুলবে। তিন টোকা মানে— অসাধারণ, অতি দুর্লভ, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও আকস্মিক দৃশ্য। এই মুহূর্তেই না নিলে সারাজীবন আপসোস করতে হবে!

আমি সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ট্রেনে আর আমার সহযাত্রিণী কলকাতা থেকে প্লেনে একই দিনে রওনা হয়ে ঠিক একই সময়ে হেলসিংকির হোটেলে পৌঁছে রিসেপশনে দুজনে দুজনের খোঁজ করতে গিয়ে একইসঙ্গে পরস্পরের সাক্ষাৎ পাই। কলকাতা থেকে সাতসকালে বেরিয়ে লন্ডনে বিমান বদলে হেলসিংকির হোটেল খুঁজে পেতে তাঁর তিলেক ভাবনা হয়নি। এখন রোভানিয়েমি থেকে সামান্য ইনারির বাসে বাধ্যতামূলক বিনা টিকিটের যাত্রী হয়ে ভয়ে কাঁটা। ছেলেটিকে যতই বোঝাই, সব বৃথা, সে কিছুতেই টাকা নেবে না। কেন? আমরা ভাড়ার পুরো টাকা আগাম দিয়েছি। কীভাবে? কেন, এই যে তার বাস-কোম্পানির কাছে রোভানিয়েমির 'মাটকা ভেক্কা' ট্র্যাভেল এজেন্সির পাঠানো ই-মেল বার্তার প্রিন্ট!

এই বার্তার পিছনের তথ্যটি এই। আমাদের হ্যামারফেস্ট যাবার বাসনা শুনে মাটকা ভেক্কার মহিলা কর্মী অনেকক্ষণ ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করেও যখন পথের হদিশ দিতে পারলেন না এবং স্বীকার করলেন যে তাঁরা শুধু সমগ্র ফিনল্যান্ডে আর দক্ষিণ নরওয়ের ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন, উত্তর নরওয়ের কথা বিশেষ জানেন না, তখন আমিই তাঁকে আমার এযাবৎ সংগ্রহ করা সব তথ্য জানিয়ে অনুরোধ করেছিলাম রোভানিয়েমি থেকে লেক ইনারি ও ইনারি থেকে লাকসেলভ হয়ে হ্যামারফেস্ট পর্যন্ত বাসের আসন সংরক্ষণ করে দিতে। বাসটি এসকেলিসেন লাপিন লাইনের।

আবার ইন্টারনেট খুঁজে, দু-চারটে ফোন করে মাটকা ভেক্কার মহিলাটি জানালেন, 'এই লাইনের বাস নর্থ কেপ পর্যন্ত যায়। সেখানে পৌঁছয় রাত সাড়ে দশটায়।'

যখনই হ্যামারফেস্ট যাবার পথ ও পরিবহণের খোঁজ করেছিলাম, তখনই মনের চোখে ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করে উঠেছে ওয়ার্ল্ড ম্যাপে সুমেরু সমুদ্রকূলে নরওয়ের সর্বোত্তর বিন্দুটি। নরওয়েইজীয় ভাষায় যার নাম নর্ড কাপ। ইংরিজিতে নর্থ কেপ, যেখানে এখন জুনের তৃতীয় সপ্তাহে সূর্য অস্তই যায় না।

সেই নর্থ কেপে বাসে যাওয়া যায় শুনে মন আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। যদি হ্যামারফেস্টই যাব, তাহলে তারও উত্তরে নর্থ কেপ যাব না তাই কী হয়? কিন্তু সমস্যা হল রাত সাড়ে দশটায় পৌঁছে সেখানে থাকব কোথায়? সারারাত সূর্যোজ্জ্বল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে শুধু সূর্যদর্শন করে নর্থ কেপের ঠান্ডায় কাটাব কী করে? খোঁজ খোঁজ, কী উপায়? যারা যায় তারা কী করে? পৃথিবীর নানা দেশ থেকে কৌতূহলীরা নর্থ কেপে আসে মধ্যরাতের সূর্য দেখতে। তারা ঘুমোয় কোথায়? যদি নাও ঘুমোয়, যদি বসে বা দাঁড়িয়েও থাকে, তারই বা কী ব্যবস্থা?

আরও তথ্য খুঁজতে খুঁজতে জানা গেল বিদেশের পর্যটকরা চার্টার্ড প্লেনে সোজা এসে নামেন হোনিংসবাগে, হ্যামারফেস্টের কিছুটা উত্তরে। সেখান থেকে ট্যুরিস্ট কোচে নর্থ কেপ। মধ্যরাতের সূর্যদর্শন সেরে নেমে আসেন হোনিংসবাগে। ওসলো, বারগেন ইত্যাদি কয়েকটি জায়গায় বিমান বদলেও হোনিংসবাগ পর্যন্ত আসেন অনেকে।

আমরা যাব বাসে, আমাদের রাতের ব্যবস্থা কী হবে? ওই বাসই নর্থ কেপ থেকে রওনা হবে রাত ১টায়। ৩৫ কিলোমিটার নেমে এসে বাসটা বাকি রাতটুকু কাটাবে হোনিংসবাগে। তারপর ভোর পাঁচটায় হোনিংসবাগ ছেড়ে আবার ধরবে রোভানিয়েমির রাস্তা।

হোনিংসবাগে হোটেল নেই? হোনিংসবাগে রাতটুকু থাকার একটা ব্যবস্থা হয় না? নেটে খুঁজতে খুঁজতে

ছোট একটা হোটেল পাওয়া গেল। মাটকা ভেক্কার মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হেড ফোন চড়িয়ে কম্পিউটার-ফোনে আমাদের জন্য ঘর বুক করে দিলেন। তবে যেদিন নর্থ কেপ পৌঁছব সে রাতের জন্য নয়, সেদিন কোনও ঘর খালি নেই। পরদিনও হল না, অতএব তার পরদিন।

এ তো দেখছি ঘরে যাইতে কাল মোর হৈল অফুরান!

ঘর ঠিক হলে তবে তো পথের ব্যবস্থা। বাসের বুকিং। ঘরের তারিখের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাত্রার তারিখ ও পথে বিরতির মেয়াদ ঠিক হল। সেইমতো রোভানিয়েমি থেকে ইনারি। ইনারি থেকে লাকসেলভ, লাকসেলভ থেকে নর্থ কেপ। নর্থ কেপে সূর্যদর্শন ও রৌদ্রোজ্জ্বল চিত্রগ্রহণ সেরে হোনিংসবাগে ফেরা।

বাসের সিট বুক করতে হবে এই যাত্রাপঞ্জি মতো। এতদূর এগিয়ে জানা গেল বাসে আগাম সিট বুক করা যায় না। বাসে উঠে ড্রাইভারকে পয়সা দিয়ে টিকিট নিতে হয়।

বেশ, তাহলে আমাদের যাত্রাসূচি জানিয়ে একটা ই-মেল করে দিলেই তো হয় বাস কোম্পানিকে যে— ওই ওই জায়গা থেকে ওই ওই তারিখে আমরা নিশ্চয়ই বাসে উঠব। বুকিং না নিক, শুধু জানিয়ে রাখতে তো দোষ নেই!

ফিনিশ ভাষায় লেখা সেই ই-মেলের একটা কপি আমি চেয়ে নিয়েছিলাম।

রোভানিয়েমিতে বাসের ড্রাইভারকে সেটা দেখিয়ে কবে, কোথায় আমাদের নামাতে হবে, কবে, কোথা থেকে আবার আমরা বাসে উঠব, ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম। বার্তার বাঁদিকে যাত্রার তারিখ ও ডানদিকে ভাড়ার অঙ্ক রোমান হরফে লেখা, ফলে আমারও বুঝতে অসুবিধে হল না।

সকলের কাছে এসে ভাড়া নিয়ে টিকিট দিচ্ছে, আমাদের পেরিয়ে চলে গেল, ফিরলও আমাদের সিট পার হয়ে, কিন্তু কই, আমাদের দুজনের টিকিটের ভাড়া তো নিল না! সোজা গিয়ে ড্রাইভারের আসনে বসে বাস ছাড়বার উপক্রম করছে।

আমি-ই উঠে গিয়ে ভাড়ার টাকা বাড়িয়ে দিলাম, সে শুধু 'নো' 'নো' করে। ভাড়া নেবার পক্ষে সবরকম যুক্তি-তক্কো হার মেনে গেল। আমার সহযাত্রিণীর উদ্যোগও বৃথা গেল, কিছুতেই তাকে টিকিটের দাম নিতে রাজি করা গেল না।

রোভানিয়েমিতে সকলের সঙ্গে আমাদের বাক্সও বাসের পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সারাদিন বাসযাত্রার পর লেক ইনারিতে নেমে বাক্স বের করে নিজেই বয়ে নিয়ে বাসস্টপ থেকে দশ-পনেরো পা দূরে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল। পরশু আবার এই সময় এখান থেকে আমাদের তুলে নেবে। যাব লাকসেলভ। ইনারি থেকে দুশো কিলোমিটারের মতো।

ইনারিতে ইনারি হ্রদের তীরে ছোট্ট হোটেল— নামও ইনারি হোটেল।

এখানেই ফিনল্যান্ডের আদিবাসী সামি উপজাতির মানুষের সঙ্গে দেখা হল। হোটেলের খাতায় নাম-ধাম লিখতে লিখতেই চোখে পড়ল, জিনসপ্রধান যুগেও তাদের চিরাচরিত পোশাক পরা একদল সামি যুবক উচ্চকণ্ঠে ভদকা সেবন করছে। আদ্যিকাল থেকে ল্যাপল্যান্ড কিন্তু বল্গা হরিণ আর এই হরিণ-পালক সামি উপজাতির মানুষদেরই ছিল। সামিদের জীবন-জীবিকা, ঘরদরজা, রীতিনীতি সবই তাদের নিজস্ব। এখনও ল্যাপল্যান্ডের কোথাও কোথাও রয়েছে, সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। সাবেকি পোশাক পরা বেশ কয়েকজন সামি যুবক-যুবতীকে ইনারির রাস্তায় ঘাটে দোকানে বাজারে রেস্তোরাঁয় বারে দেখা গেল।

সামিদের হস্তশিল্প নিয়ে ল্যাপল্যান্ডে অনেকেই এখন আগ্রহী হয়েছেন। এর রক্ষণাবেক্ষণ, গবেষণা ও প্রচারেও নেমে পড়েছেন কেউ কেউ। এঁদের মধ্যে শিক্ষিত আধুনিক সামি যেমন আছেন, তেমনই এই উপজাতির অন্তর্ভুক্ত নন এমনও আছেন অনেকে। সামিদের আদি ও আসল জীবিকা রেইনডিয়ার লালনপালনের ব্যাপারেও এখন সরকারি উদ্যোগ ও সহযোগিতা দেখা যাচ্ছে বলে শুনলাম।

তাই বলে উন্মুক্ত প্রান্তরে, সবুজ পাহাড়ে পালে পালে বল্গা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাব না? রাস্তার এপারে আমাদের হোটেল, ওপারে কাছাকাছি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছোট ছোট কয়েকটা দোকান। সবই সামি উপজাতির সাবেকি হস্তশিল্পের।

বল্গা হরিণ দেখতে হলে সামিদের গ্রামেই যেতে হয়। হস্তশিল্পের একটা দোকানে ঢুকে মালকিন মহিলাকে

মনের ইচ্ছাটা বুঝিয়ে বলতেই তিনি মহা উৎসাহে জানালেন যে তিনি নিজের বাড়িতেই বল্গা হরিণের লালনপালন করেন। কাল সকালে যদি আসি পালে পালে বল্গা হরিণ দেখা কোনও ব্যাপারই নয়।

কাল ইনারি ছেড়ে আরও একটু উত্তরে লাকসেলভ যেতে হবে শুনে মহিলা বললেন, 'দাঁড়ান, এখনই আমার স্বামী তাঁর গাড়ি নিয়ে চলে আসবেন, তাঁর গাড়িতে আমরা এখনই যেতে পারি।'

মহিলার সুদর্শন স্বামী এলেন বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষে এখনই বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়।

মহিলা তাতেও দমলেন না। তক্ষুণি কাকে ফোন করে ফিনিশ ভাষায় কী বললেন জানি না, ফোন নামিয়ে রেখে যা বললেন তার অর্থ, তাঁর এক বন্ধু বল্গা হরিণ আর হরিণ-পালক সামিদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। সেই মহিলা এখনই আমাদের নিয়ে যেতে গাড়ি নিয়ে এসে পড়লেন বলে। তবে গাড়ির তো একটা খরচ আছে। সে-বাবদ সামান্য তিরিশ ইউরো আমাদের দিতে হবে। সেটা কি খুব বেশি?

সন্ধের মুখে কে না কে এরকম হুট করে বল্গা হরিণ দেখাতে কোথায় না কোথায় নিয়ে যেতে আসছে, মন বলল, যাওয়া উচিত নয়।

বললাম, 'কালই এখান থেকে চলে যাব। এখন আর যাওয়া ঠিক হবে না।'

মহিলা তক্ষুণি একটা কাগজে বন্ধুর ফোন নম্বর লিখে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখুন, আজ রাতে বা কাল সকালেও যদি যাবার কথা ভাবেন, একটা ফোন করে দেবেন, তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে আপনাদের হোটেলে চলে আসবে।'

সন্ধেবেলা আমাদের ছোট্ট হোটেলের ছোট্ট ডাইনিং হল কাম রেস্তোরাঁয় একজনের বেকড স্যামন দুভাগ করে দুজনের রাতের আহার সারতে বসেছি, দেখলাম দুটো টেবিল বাদে সামিদের হস্তশিল্পের দোকানের সেই মহিলা ও তাঁর স্বামী স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে বিয়ার সহযোগে আড্ডা দিচ্ছেন বা আলোচনা করছেন—হয়তো সামি উপজাতি বা তাদের বল্গা হরিণের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

যাই হোক, ইনারিতে এসেও ল্যাপল্যান্ডের বল্গা হরিণ আমার স্বপ্নেই রয়ে গেল।

পরদিন ঠিক পাঁচটা পাঁচে সেই বাস কোম্পানির বাসই এল, কিন্তু সেই ড্রাইভার আসেনি। আজকের চালক শ্মশ্রুগুম্ফময় বড়সড় চেহারার সাহেব। ভাড়া নিতেও দ্বিধা করলেন না। আমি রোভানিয়েমি থেকে নর্থ কেপ ও সেখান থেকে হোনিংসবাগ ফিরে আসার পুরো ভাড়া দিতে গেলাম।

ড্রাইভার কিংকর্তব্যবিমূঢ় গলায় বললেন, 'আপনারা আসলে যেতে চান কোথায়?'

'নর্থ কেপ, হোনিংসবাগ হয়ে হ্যামারফেস্ট।'

'এবাস সেখানে যাবে না। হ্যামারফেস্ট এপথেই পড়ে না।'

শেষপর্যন্ত তিনি ইনারি থেকে নর্থ কেপ পর্যন্ত ভাড়া হিসেব করে নিয়ে সেইমতো প্রিন্ট আউট দিলেন। লাকসেলভ থেকে নর্থ কেপ পর্যন্ত এই টিকিটেই যাওয়া যাবে তাও লিখে দিলেন। নর্থ কেপ যেতে পথে তিনটে টানেল পড়বে, সাগরপিঠের চেয়েও নীচ দিয়ে চলে গেছে সেই সুড়ঙ্গ, তার একটা সাত কিলোমিটার দীর্ঘ, সেই তিন সুড়ঙ্গ পারানির কড়িও এই ভাড়ার মধ্যে ধরা আছে।

আগে তো নর্থ কেপে পৌঁছই, তারপর হ্যামারফেস্টে যাবার রাস্তার খোঁজ করব।

বাস বেশ জোরে চলছে। দুজনে রাস্তার দুদিকে চোখ রেখেছি। যদি কোথাও বল্গা হরিণ চরতে দেখা যায়। ল্যাপল্যান্ডের নিসর্গ দেখে চোখ ভরে গেছে, কিন্তু এই অপরূপ নিসর্গের সন্তান সেইসব বল্গা হরিণের দল কোথায় গেল? ফিনিশ ল্যাপল্যান্ডে দেখা পেলাম না, এবার ফিনল্যান্ডের সীমান্ত পেরিয়ে চলেছি নরওয়েতে।

নরওয়ের লাকসেলভে রাস্তার ধারেই ছোট্ট হোটেল। রাস্তার ওপারে অদূরে পাহাড়ের কোলে-বুকে মেঘ গা হাত পা এলিয়ে দিয়েছে।

ঘর বুক করার সময়ই বলা ছিল দোতলা বা তিনতলায় ঘর হলে যদি লিফট না থাকে তাহলে বাক্স বইতে একটু সাহায্য করতে হবে। মস্কো সম্মেলনের কাগজপত্রে আমার বাক্স ওজনে ভালোই বেড়েছে। তার ওপর সহযাত্রিণীও পৃথিবীর সর্বোত্তর শহরের ঠান্ডার মোকাবিলা করতে তাঁর বাক্সের ওপর বিশেষ দয়া দেখাননি।

বাস থেকে হোটেলের সামনেই নামিয়েছে। হোটেলের দিকে দু পা এগিয়েছি কি এগোইনি এক নরওয়েইজীয় যুবক এসে দুহাতে আমাদের বিশাল বাক্স তুলে নিয়ে হোটেলে ঢুকে গেল। এই দুটো বাক্স ও

আমাদের ক্যামেরা ইত্যাদিতে ভারি আরও দুটো হাতবাক্স নিয়ে ভদ্রলোক একটা লিফটে উঠতে উঠতে বললেন, 'এই লিফট গুড ফর দ্য গুডস ওনলি। আপনারা চড়লে শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছবেন বলা অসম্ভব।' বলে আমাদের সিঁড়ি দেখিয়ে দিলেন।

রাতে ডিনারে কী পাওয়া যায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে জানলাম আমাদের সেই মালবাহক আসলে এই হোটেলের কুক।

একজনের জন্য মুরগির একটা পদ, আরেকজনের এক প্লেট সালাদ। নৈশাহার সেরে জনহীন রাস্তায় এক চক্কর ঘুরে এসে আমি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মানচিত্রে মন দিলাম।

পরদিন লাকসেলভ ছেড়ে যাব, দুপুরে খাদ্যতালিকায় মনোমতো ব্যঞ্জনের অসাক্ষাতে কী খাওয়া যায় মনস্থির করতে পারছি না। মালকিন বা ম্যানেজার বা পরিচারিকা যথাসাধ্য আমাদের খাদ্যরুচি বোঝবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় গতকালের মালবাহক-কাম-রন্ধনশিল্পী এসে বললেন, 'কাল তোমাদের খেতে কষ্ট হয়েছে। আজ তোমাদের জন্য আমি পাঁচরকম ব্যঞ্জন রেঁধে আনছি। ভাজা, সেদ্ধ, ঝোল, তাজা সালাদ— সব একটু একটু। দ্যাখো তো ভালো লাগে কিনা।'

'কত দাম পড়বে?'

'মাথাপিছু দেড়শো ক্রোনার দিও।'

'দাম একটু বেশি হয়ে গেল।'

'দুজনের দুশো দিও।'

খেয়ে মন ভরে গেল। বেগুনি, পেঁয়াজি, মুণ্ডহীন হেরিং মাছভাজা, গ্রিল্ড স্যামন (স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সব দেশেই বলে স্যালমন), সালাদ, একটু ভাত, একটু মুরগি, একটু বোধহয় ডালও ছিল।

বাস আসবার পাঁচ মিনিট আগে আমাদের বাক্সপ্যাঁটরা দোতলা থেকে নামিয়ে হোটেলের সামনেই বাসস্টপে রেখে দিয়ে বললেন, 'আমি কাজ ফেলে এসেছি। এদিকে আমার নজর থাকবে, বাস আসামাত্রই চলে আসব। নর্থ কেপ থেকে ফেরার ব্যাপারে ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দেব।'

আজ আবার সেই কিশোর ড্রাইভার। ওকে দেখে ভারি আনন্দ হল। ও-ও খুব খুশি। আজ বয়েস জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। ওর নাকি ২৪ চলছে। আমরা ভেবেছিলাম সতেরো-আঠেরো! বাস থেকে বাইরের ছবি তুলব বলে ওর পাশের সিটে এসে বসেছি।

একসময় আমাকে বিশ্রীরকম চমকে দিয়ে ছেলেটি বলে উঠল, 'লুক লুক, রেইনডিয়ার!'

বাস এত জোরে ছুটছে যে বিপজ্জনকভাবে উঠে দাঁড়িয়েও বহুদূরে বনের ধারে ছাগলছানা বা খরগোশের মতো একপাল চতুষ্পদ ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না।

পথের দুধারের দৃশ্য দ্রুত বদলে গেল। একটু পরেই রাস্তার যা রূপ হল তা ভাষায় লেখার চেষ্টা বৃথা। একধারে পাহাড়, আরেক ধারে সমুদ্র। সমুদ্র কখনও খাঁড়ি, কখনও অসীম। ভিডিও ক্যামেরায় সেই অপার্থিব আর্কিপেলাগোর নির্নিমেষ ছবি তুলছি। সূর্য যখন সরাসরি ক্যামেরার লেন্সে এসে পড়ে বা সামনের কাচে আগুন ধরিয়ে দেয় তখন আমার চোখ আর ক্যামেরার লেন্স দুটোই বন্ধ। জেগে থাকে শুধু অন্তর।

সৌন্দর্যের এ কী রূপ! সুন্দর যেন এখানে পরীর মতো আকাশ থেকে নেমে আপনমনে খেলা করছে।

এরকম বেশ কয়েকঘণ্টা চলার পর কুয়াশায় চরাচর লুপ্ত হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই এরকম হয়। কখনও ক্ষণিক, কখনও অনেকক্ষণ।

সেই লুপ্ত চরাচরে ড্রাইভার স্টিয়ারিং ছেড়ে দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে তার অল্প ইংরিজিতে বারবার বলতে থাকে— 'হোয়্যার ইজ রোড? হোয়্যার উই গো? হোয়্যার উই গো?'

এরই মধ্যে আকাশ রাঙিয়ে চিরপরিচিত রামধনু উঠতে দেখে খেয়াল হল চারপাশের এই অপরূপ সৌন্দর্য স্বর্গের মতো অলৌকিক নয়, এ তো মর্ত্যেরই এক বাস্তবতা!

যখনই দুষ্পার কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে যায়, যাত্রীরা স্তব্ধ, তখন শুধু আমাদের সারথির সকৌতুক গলা শোনা যায়— 'হোয়্যার উই গো?'

সত্যি, পথই যদি নিরুদ্দেশ, তাহলে কোথায় চলেছি আমরা?

কুয়াশা খানিকটা ফিকে হতে দেখা যায় ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী পথ চলে গিয়েছে দূরে। কখনও পাহাড়ের কোল ঘেঁসে, কখনও পাহাড়ের সুড়ঙ্গ ধরে। এভাবেই হোনিংসবাগ পার হয়ে এগিয়ে চললাম নর্থ কেপের দিকে।

কখনও রাস্তার এপাশে, কখনও ওপাশে, কখনও বা দুপাশেই, যেন স্বপ্নের জগৎ। সত্যিই যেন একইসঙ্গে স্বপ্ন আর জাগরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ধ্বংস-হত্যা হিংসা-ঘৃণাময় পৃথিবী যেন অন্য গ্রহে ফেলে এসেছি। যেন আগের জন্মের ঘটনা।

টোল ট্যাক্স জমা দিয়ে এবার পথের শেষটুকু। রাত ঠিক সাড়ে দশটায় পৌঁছে গেলাম ৭১ ডিগ্রি ১০ মিনিট ২১ সেকেন্ড উত্তরে, সুমেরু মহাসমুদ্রের কূলে নর্থ কেপে। সুমেরু মহাসমুদ্র থেকে হাজার ফুট খাড়া উঠে এসেছে। এই ঊষরভূমি প্রথম জরিপ করেছিলেন ইতালির ফ্রান্সেসকো নেগ্রি। নর্থ কেপে তিনিই প্রথম পর্যটক। এসেছিলেন ১৬৬৪ সালে।

বিরাট একটা পাহাড়ের মাথা কেটে সমতল করে দিলে যেমন দেখায় জায়গাটা দেখাচ্ছে অনেকটা সেইরকম একটা চত্বরের মতো। মনে হয় যেন ভূমণ্ডলের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি। তা তো হবার নয়। তবু মনে হয় যেন মর্ত্যে দাঁড়িয়েই মহাকাশের স্পর্শ পাচ্ছি। কোথায় পড়ে আছে আমাদের নীচের অন্ধকার পৃথিবী!

মনুষ্যবসতির বাইরে এরকম একটা পোড়ো পাহাড়ি জমির গুরুত্ব যে কতটা, নানা দেশের পর্যটকদের ভিড় দেখেই তা মালুম হয়। এরই মধ্যে মা ও শিশুর ভাস্কর্য, নানা দেশের শিশুদের তৈরি দেশ-দেশান্তরের সীমান্ত ছাপানো সুখ-শান্তি-সহযোগিতাকামী স্তম্ভ, এসবও রয়েছে।

রাত ১২টায় এই ঊষরভূমির চারপাশের আকাশ আর মহাসমুদ্র জ্বালিয়ে সূর্য ঝলমল করছে!

দেখছি আর ছবি তুলছি, সহযাত্রিণীর ভয়, বাস ছেড়ে দেবে না তো? চাঁদের পিঠের মতো ন্যাড়া চত্বরে এখানে-ওখানে কয়েকটি স্তম্ভ ও দেওয়াল, তাতে কিছু চিত্র ও ভাস্কর্য। এছাড়া ওই পাথুরে চত্বরে চোখে পড়বে ৫ হাজার বর্গফুট 'নর্থ কেপ হল'। খাবার, পানীয় ও স্যুভেনিরের দোকানও ওই হলের মধ্যে। ওর ভেতর দিয়েই যাতায়াতের পথ। প্রায় দৌড়ে সে পথ পেরিয়ে আরও দ্রুত পা চালিয়ে অন্যান্য বাসের মধ্যে আমাদের বাস খুঁজে পেলাম একেবারে শেষ মুহূর্তে। ড্রাইভারের দুহাতে দুটি প্লাস্টিক ব্যাগ। মুখ হাসিতে, মন খুশিতে ভরা। ছেলে বা মেয়ের জন্য একটা পুতুল কিনেছে। কিছু খাবারদাবারও দেখা যাচ্ছে। আমার প্রতি তার বিশেষ সন্তোষের ভাব। নর্থ কেপে নামবার সময় আমি জোর করে তার হাতে ৫০ নরওয়েইজিয়ান ক্রোনার গুঁজে দিয়েছিলাম। ভাড়া তো গছাতে পারিনি, তাই এই ঋণমুক্তি।

রাত দুটোয় পৌঁছলাম হোনিংসবাগ। নর্থ কেপ থেকে ৩৫ কিলোমিটার পিছিয়ে। হোনিংসবাগ প্রায় ৭১ ডিগ্রি উত্তরে। হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে দুই বালিকা শুধু আমাদের জন্যই জেগে আছে।

ঘরের চাবি নিয়ে সসঙ্কোচে রাতে খাবারের কথা জিজ্ঞেস করে এক প্যাকেট পোট্যাটো চিপস ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

সমুদ্রের খাঁড়ির ধারে ছোট্ট হোটেল। ছোট্ট ঘর। তার মধ্যেই বাথরুমের লাগোয়া সাবেক ফিনিশ রীতির কাঠের আলাদা সাওনা ঘর। শুধু এই ঘরের অতিথির সাওনা স্নানের জন্য।

ভারতীয় মতে পরদিন, সাহেবি মতে সেদিনই, সকালে হোনিংসবাগ পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখে ভারি ভালো লাগল। ছোট্ট জায়গা, অল্প ঘরবাড়ি, সবই কাঠের, সব কটিই রঙিন। কোনওটি লাল, কোনওটি সবুজ, কোনওটি নীল, কোনওটি বেগুনি। কালো রঙের বাড়িও দেখলাম। সাদা রংও দেখেছি। অসংখ্য সি গাল। মানুষের সংখ্যা সে-তুলনায় সামান্য। ভুল করে মনে হতে পারে এ জনপদ বুঝি আসলে সি গালদেরই দেশ। জলের ধারে, জলে ঘেরা এ বুঝি কোনও জনপদও নয়, এ যেন এক জলপদ। যদি শহর হত, বলা যেত জলসই শহর। এখানকার প্রাচীন বাসিন্দারা একে শহর ভাবতেই ভালোবাসেন, এদের দাবি পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের শহর হ্যামারফেস্ট কেন হতে যাবে, তাদের হোনিংসবাগ নয় কেন? সমুদ্রের ধারে একঝাঁক সি গালের ছবি তোলার ফাঁকে হোনিংসবাগ-হ্যামারফেস্টের এই দ্বন্দ্বমধুর সম্পর্ক নিয়ে এক বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে যে যুক্তিজাল জানা গেল তা এই— হোনিংসবাগ ৭০°৫৮′৬০″ উত্তরে, হ্যামারফেস্ট ৭০°৩৯′৪৮″ উত্তরে। অতএব অধিক উত্তরে হওয়া সত্ত্বেও হোনিংসবাগ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের শহর নয় কেন? হ্যামারফেস্টের লোকেদের নাকি বক্তব্য— হোনিংসবাগ শহর নয়। মানুষের ঘরবাড়ি আছে, সুপার মার্কেট আছে, দ্বিস্তর রাস্তা

আছে, তবু এটা শহর হবে না কেন? তবে দেখে ভালো লাগল, এই তর্কে কারও মনে কোনও তিক্ততা নেই।

হ্যামারফেস্ট যাবার রাস্তার খোঁজ নিয়ে জানলাম, হোনিংসবাগ থেকে সারাদিনে বেশ কয়েকটা বাস যায় হ্যামারফেস্ট। বেলা তিনটেয় একটা বাস আছে। আমাদের হোটেল খাঁড়ির পাড়ে, অতএব একতলার রাস্তায়। বাস চলে ওপরের রাস্তায়। বাসস্টেশন হোটেল থেকে খুব একটা দূরে না হলেও, হোটেলের মেয়েটি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিল।

এই অঞ্চলের বাসের সময়সূচির একটা পুস্তিকায় আমি হ্যামারফেস্টের বাস ছাড়ার যে জায়গাটা দেখেছিলাম, সেটা আমাদের হোটেল থেকে ওপরের রাস্তায় উঠে বাঁদিকে কিছুটা এগিয়ে বন্দর এলাকায়। ট্যাক্সি ড্রাইভার সেকথা শুনে বললেন, 'না, না, আপনাদের যেতে হবে বাস টার্মিনাসে। সব বাস সেখান থেকেই ছাড়ে।'

যথারীতি টার্মিনাসে পৌঁছে দেখা গেল কোথাও কোনও বাস নেই। ড্রাইভারের সোৎসাহ প্রস্তাব, 'বাস এলে আমি উঠিয়ে দেব, ততক্ষণ এই ট্যাক্সিতেই আপনারা শহরটা ঘুরে দেখুন। এই আমি মিটার বন্ধ করে রাখলাম।'

শেষপর্যন্ত তিনি আমার সেই চেনা বন্দর এলাকায় আমাদের পৌঁছে দিলেন। সেখানে ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন অফিসে আমাদের বাক্স রাখার ব্যবস্থাও দেখিয়ে দিলেন। ভাড়া নিলেন সেই মিটার বন্ধ করার আগে যা উঠেছিল সেইটুকু।

ডাঙায় বাস দাঁড়িয়ে আছে। জলে বিরাট জাহাজ। বাস আসছে, ছেড়ে যাচ্ছে। এখানেই ট্যুরিস্ট ইনফোর পাশেই স্যুভেনির শপ। স্ক্যান্ডিনেভীয় উপকথার সহাস্য ডাইনি বুড়ি সব দোকানে থাকবেই। নরওয়ে, ফিনল্যান্ড— সব জায়গাতেই এই ডাইনি বুড়ির নানান মূর্তি। দেখে ভয় লাগে না, মজা লাগে।

হোনিংসবাগ থেকে হ্যামারফেস্ট যেতে মাঝে এক জায়গায় বাস বদলাতে হল। হ্যামারফেস্ট পৌঁছলাম সন্ধের মুখে। জলস্থল সূর্যের আলোয় ভেসে যাচ্ছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের শহর ও গুরুত্বপূর্ণ উপকূলশহর হিসেবে হ্যামারফেস্টের খ্যাতি হলেও এর আয়তন কিন্তু মাত্রই ৮৪৪ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা দশ হাজারেরও কম। তবে পর্যটকদের বেশ ভিড়, বছরে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ আসেন হ্যামারফেস্ট দর্শনে।

সেই হ্যামারফেস্ট। ম্যাপে জায়গাটা দেখলে বুক হিম হয়ে আসে। সুমেরু মহাসমুদ্রে ছোট্ট একটা শোলার টুকরোর মতো ভেসে আছে। এখানে যাব বলেই এবার বেরিয়েছি। নিজের চোখে দেখব আর সুমেরুবৃত্ত ভ্রমণের একটা ভিডিও চিত্র তৈরি করব— এই বাসনা।

অসীম সমুদ্রের তীরে মাঝারিমানের বড় হোটেল। সামনেই নীরব, নির্জন পুলিশ ফাঁড়ি, অল্প এগিয়ে বন্দর। পুরো ডানদিক জুড়ে সুদীর্ঘ সবুজ পাহাড়, হ্যামারফেস্টের প্রাকৃতিক প্রাচীর।

ভারি সুন্দর, ঘরোয়া শহর দেখেই সারাদিন কেটে গেল। রাত বলে কিছু নেই, সারারাতই আকাশে দিনের আলো। শুধু দুঃখ, একটাও তারা নেই। অন্ধকার না থাকলে তারা থাকে কী করে! সামনেই পূর্ণিমা, তবু চাঁদ নেই।

পরদিন ফিরে যাব। যেতে হবে ওসলো, সেখান থেকে ভিয়েনা। ভিয়েনা থেকে আমাদের দেশে ফেরার বিমান। দুজন যাব দুই বিমানে।

আসবার যে রাস্তা জেনেছি, সে পথে গেলে তো আবার সেই রোভানিয়েমি হয়ে হেলসিংকি। তাহলে নরওয়ের আর কোথাও যাওয়া হয় না। বিশেষ করে নরওয়ের বিখ্যাত সেই দীর্ঘ পাহাড়ঘেরা সমুদ্রোপকূল-সংলগ্ন সব শহর বা ত্রয়োদশ শতকের রাজধানী বারগেন না দেখেই ফিরে যাব?

বল্গা হরিণও দেখা হল না।

যাকেই বলি, নিস্পৃহ উত্তর, ওই পাহাড়ে তারা চরতে আসে।

তবু ফিরতে হবে। লক্ষ্য এখন একটাই। ফেরার পথে যাতে বেশি বেশি শহর বন্দর জনপদ দেখতে দেখতে যাওয়া হয়।

যেপথেরই হদিশ পাই, সেপথেই বহুবার বাস বদল অথবা কোস্টাল স্টিমার।

কোস্টাল স্টিমার? রাশিয়া-নরওয়ের সীমান্তশহর কির্কিনেস থেকে রওনা হয়ে হ্যামারফেস্ট হয়ে বারগেন যায় এরকম কোস্টাল স্টিমারের খোঁজ পাওয়া গেল। আরও আনন্দের কথা, আজই বেলা বারোটায় একটা স্টিমার হ্যামারফেস্টে আসবে, ১২টা ২০ মিনিটে ছেড়ে যাবে বারগেনের পথে।

ট্যুরিস্ট ইনফোতে গিয়ে খোঁজ করি, টিকিট কোথায় পাওয়া যায়? সহজ উত্তর— 'স্টিমারে উঠে টিকিট কাটতে হয়।'

'যদি সিট না থাকে?'

ট্যুরিস্ট ইনফো, মানে ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশনের ছেলেটি কম্পিউটার খটখটিয়ে বলল, 'দাঁড়ান, এদের অফিসে ফোন করে আপনাকে জানাচ্ছি।'

ফোনে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে ছেলেটি বলল, 'ওই তো জাহাজ ঢুকছে। এখনই নোঙর করবে। আপনি ভেতরে গিয়ে খোঁজ করলে ঠিক তথ্য জানতে পারবেন। '

ইনফো অফিসের ঠিক বাইরেই স্টিমারঘাটা। কোথায় স্টিমার! এ তো ছ-সাততলা বিরাট জাহাজ। ছেলেটিই পৌঁছে দিয়ে গেল।

জাহাজে ঢুকে শুনি আমরা ট্রমসো পর্যন্ত যেতে পারি। ট্রমসো থেকে অন্য দুজন যাত্রীর বুকিং আছে। তবে ট্রমসো থেকে পরদিন একই সময় অন্য জাহাজে বারগেন যেতে পারব।

ট্রমসো এখান থেকে একটা স্টপ। ট্রমসো পৌঁছবে রাত ১টা ৫-এ। বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে ট্রমসোয় সারারাত সারাদিন অপেক্ষা করে পরদিন আবার রাত ১টা ৫-এ জাহাজ ধরা খুব সহজ হবে না।

তবু এছাড়া আর উপায়ই বা কী। হোটেলে ফিরেই পরিকল্পনাটা বিশদ করার সময় দেখা গেল জাহাজ ছাড়ার আর মাত্র ১০ মিনিট বাকি। হোটেল থেকে জাহাজঘাটা বা স্টিমারঘাটা যাই হোক, পাঁচ মিনিটের পথ। আর পাঁচ মিনিটে কোনওক্রমে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া কি একেবারেই অসম্ভব?

ঘরে এবিষয়ে প্রবল দ্বিমত।

এইসব কথার মধ্যেই মেয়েলি গলায় 'হাউস কিপিং' শুনে দরজা খুলে দেখি কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের একটা মেয়ে রুম মেক-আপ করতে এসেছে। যদি অনুমতি দিই তাহলে বাথরুম ধুয়ে-মুছে, তোয়ালে, বিছানার চাদর বদলে সে এখনই ঘরটাকে গুছিয়ে দিতে পারে।

একেও একবার বল্গা হরিণের কথা জিজ্ঞেস করে দেখা যায় না?

মেয়েটি হাতে গ্লাভস পরে বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিল, আমার প্রশ্ন শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, বাড়ি থেকে কাজে আসবার পথে আজ সকালেই সে পাহাড়ের মাথায় একদল রেইনডিয়ার চরতে দেখেছে।

'আমাদের দেখাতে পারো?'

'আশা করি, পারব।'

'কখন?'

'বিকেল পাঁচটায় আমার কাজ শেষ হবে। আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাব। ঠিক পাঁচটা দশে আপনাদের দরজায় নক করব।'

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে জানলাম, বাড়ি সুইজারল্যান্ডে। প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কোর্স শেষ করেই এখানে এসে হোটেলের ঘর বাথরুম ধোয়া-মোছা, সাজানো-গোছানোর কাজ নিয়েছে। স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে হোটেলের বাথরুম পরিষ্কার করার কাজে কেন? না, পৃথিবীটা দেখে বেড়াতে চায়। এখানে আসবার পথে রাশিয়া খুব ভালো করে বেড়িয়ে এসেছে। গ্রীষ্মকালটা হোটেলের কাজ করে প্রথমেই যাবে কাজাখস্তানে। তারপর নেপালে। তারপর...

মস্কো, সেন্ট পিটার্সবুর্গের খুঁটিনাটি বর্ণনায় তার উচ্ছ্বাস থেকেই তার দেশ-ভ্রমণের খিদে টের পাওয়া যায়। রাশিয়া থেকে নরওয়ে এসেছে দুদেশের সীমান্তশহর কির্কিনেস হয়ে। কির্কিনেস নাকি এক আশ্চর্য সুন্দর জায়গা।

ঠিক পাঁচটা দশে দরজায় টোকা। আমরাও তৈরি হয়েই ছিলাম। কিন্তু মনে মনে একেবারেই প্রস্তুত নই। ওই উঁচু পাহাড়ে চড়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

আধঘণ্টা ওপরে ওঠার পর নীচে সমুদ্র ও সমুদ্রতীরবর্তী সরু রাস্তায় ছুটন্ত গাড়ির সারি দেখার পর আমার সহযাত্রিণী একতরফা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আর ওঠা উচিত নয়। এখান থেকে মানে মানে নীচে ফিরে যেতে পারলেই যথেষ্ট।

আমার দুশ্চিন্তাও নেই, ক্লান্তিও নেই, কষ্টও নেই। ছবি তোলার আনন্দে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে বসবার পাথর বা কাঠের বেঞ্চি পাওয়া যায়, ফলে দরকার হলেই দুজনেই জিরিয়ে নিচ্ছি।

পথপ্রদর্শিকার নাম এলিয়েনা। বলল, 'আপনারা 'এলি'ই বলবেন।'

দুজনের জিভ খুব তেতো লাগছে শুনে এলি তার জলের বোতল আমাদের দিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ জল না খাবার জন্য জিভ এরকম তেতো হতে পারে।'

জল খেয়ে কথাটার সত্যতা মানতেই হল।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে কি? এলির পাহাড়ে ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস আছে। দরকার হলে ও আমার বা আমার যাত্রাসঙ্গিনীর পাহাড়ি ঘোড়া হয়ে যেতে পারে।

মেয়েটির কথায়, ব্যবহারে আমাদের প্রতি তার যত্নের পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ।

পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে হঠাৎই একসময় আবিষ্কার করলাম, গাইড নিরুদ্দেশ। আমি গলা তুলে ওর নাম ধরে যতই ডাকি, সে ডাক বেশ জোরে আমাদের কানেই ফিরে আসে।

ওই যে দূরে একা হেঁটে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? কাছে গিয়ে দেখি, এদিক-ওদিক কী খুঁজছে, গলায় গুনগুন স্বরে গান।

'একটু গলা খুলে গাও, আমাদের শোনাও।'

'আমি রেইনডিয়ার খুঁজছি।'

'না পেলে কী আর করবে? তুমি গান শোনাও।'

'আমার গান আপনারা পরে টেলিভিশনে শুনবেন। এখন রেইনডিয়ার না দেখাতে পারলে আমার বড্ড খারাপ লাগবে। আপনাদের এতদূর নিয়ে এলাম!'

মেয়েটি আবার কোথায় হারিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। ওর ইঙ্গিতে আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। বেশ খানিকটা যাবার পর হঠাৎ দেখি অদূরে একপাল বল্গা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে!

হ্যামারফেস্টে পাহাড়ের মাথায় শেষপর্যন্ত রেইনডিয়ারের পাল দেখার এই আনন্দ এমনই আকস্মিক যে দুয়েক মুহূর্ত ক্যামেরা বার করতেই ভুলে যাই। এ যেন এক পরম আনন্দ! সব দেখারই একটা স্থান-কাল-বিষয় থাকে তো! তার সঙ্গে দেখবার তৃষ্ণাও মিলে গেলে সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

হ্যামারফেস্টে পাহাড়ের মাথায় সুমেরুবৃত্তের প্রচণ্ড রোদ্দুরে রাত দশটার পরেও আমরা একপাল বল্গা হরিণের বিচরণ দেখতে থাকি।

পরদিন কোস্টাল স্টিমার-লাইনের অন্য একটি স্টিমারে, অর্থাৎ সাততলা জাহাজে, জায়গা পেয়ে গেলাম। এবার বারগেন পর্যন্তই যাওয়া যাবে। হ্যামারফেস্ট থেকে পাঁচদিনের পথ। এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় কাজ বলতে, পাহাড়বদ্ধ খাঁড়ির অপরূপ শোভা দেখা আর একেকটি বন্দরে নোঙর ফেলা আর তোলার মাঝখানে এক-আধঘণ্টায় হঠাৎই একেকটা অচেনা শহর ঘুরে আসা। কোনও বন্দরে রাত তখন ১টা। কোনও বন্দরে রাত ৩টে। কোথাওবা ভোর পাঁচটা। পাঁচদিন ধরে শুধু চোখভরে দেখা আর ক্যাসেটভরে ছবি তোলা।

কিন্তু সে একেবারে আলাদা আখ্যান।